14 OCT 2016

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে ভাবনা

যুবায়ের আহমাদ ▷

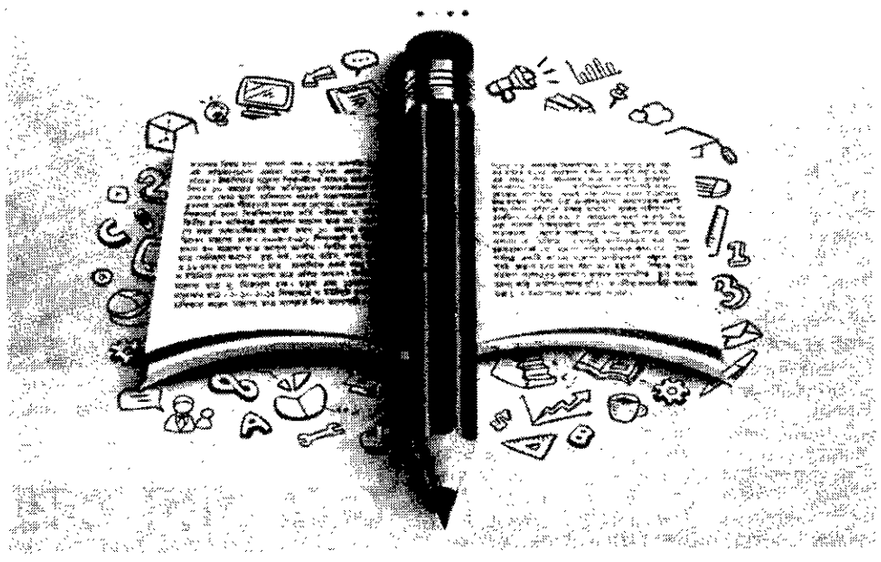

ব্রিটিশদের হাতে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মাদ্রাসাই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। শহীদ তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মওলানা ভাসানী, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের মতো সূর্যসন্তান তৈরি হয়েছিলেন মাদ্রাসা থেকেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। বাবা মৌলভি মো. ইয়াসিন খান সাহেবের কাছে গ্রহণ করা দ্বীনি শিক্ষাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বুনিয়াদ। ব্রিটিশরা ভারতে এসে প্রথম যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিল, সেগুলোর অন্যতম ছিল মাদ্রাসা বন্ধ করা। মাদ্রাসা বন্ধ হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশদের এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে।

বাংলাদেশে কওমি ও আলিয়া—এ দুই ধরনের মাদ্রাসা চালু আছে। কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষিত আদর্শ ও মেধাবী জনশক্তিকে গণমানুষের কল্যাণে আরো কাজে লাগাতে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল ১৭ সদস্যবিশিষ্ট 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে সরকার। সম্প্রতি আলেমদের এক সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির জন্য 'ন্যূনতম কারিকুলাম' দাঁড় করানোর কথা বলেন। এটা স্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতারই প্রকাশ। কওমি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বীকৃতি দিলে দেশ ও জাতি ব্যাপক উপকৃত হবে। কওমি মাদ্রাসাগুলো জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠলেও আলিয়া মাদ্রাসা সরকারি ব্যবস্থায়ই প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান সরকারের হাত ধরে ২০১০ সালে দেশের ৩১টি মাদ্রাসায় পাঁচটি বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) অধীনে অনার্স কোর্স চালু এবং ২০১৩ সালে সংসদে আইন পাস করে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। মাদ্রাসার ছাত্ররা একদিকে যেমন জঙ্গিবাদ, মাদকসহ বিভিন্ন সমাজ ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে, তেমনি তারা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রেখে দক্ষ জনশক্তি হিসেবেও নিজেদের পরিচিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

হতাশার বিষয় হলো, আদর্শ, দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তি তৈরির এই প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাফল্য অনস্বীকার্য। বিগত ১০ বছরের ঢাবির ভর্তিযুদ্ধের মেধাতালিকার দিকে তাকালে দেখা যাবে, অধিকাংশ বছরই মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রথম স্থানসহ অনেক শীর্ষস্থানই দখল করে রেখেছে। ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন মাদ্রাসা ছাত্র আ. খালেক। সে বছর মেধাতালিকায় থাকা প্রথম ১০ জনের চারজনই ছিলেন মাদ্রাসা ছাত্র। ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিটে প্রথম হন মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল আলীম। দ্বিতীয় হন মাদ্রাসা ছাত্র সেলিমুল কাদের। তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, ১৭তম ও ১৮তমও হন মাদ্রাসার ছাত্র। অন্যদিকে একই বছর ঢাবির 'ঘ' ইউনিটে প্রথম হন মাদ্রাসা ছাত্র এলিছ জাহান। দ্বিতীয় হন মাদ্রাসা ছাত্র মু. মিজানুল হক। চতুর্থ ও ১১তম হন মাদ্রাসার ছাত্র। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিটে প্রথম স্থান অধিকার করেন মাদ্রাসা ছাত্র মাসরুর বিন আনসারী। একই বছর 'ঘ' ইউনিটে প্রথম হন মাদ্রাসা ছাত্র আসাদুজ্জামান। তা ছাড়া 'খ' ইউনিটে দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম হন মাদ্রাসা ছাত্র। একই বছর 'ঘ' ইউনিটে দ্বিতীয় হন মাদ্রাসা ছাত্র।

২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাবির 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় আসনসংখ্যা ছিল দুই হাজার ২২১টি। এর বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৪০ হাজার ৫৬৫ জন ছাত্র। এর মধ্যে মাত্র তিন হাজার ৮৭৪ জন পাস করেন এবং প্রথম হন মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুর রহমান মজুমদার। একই বছর তিনি 'ঘ' ইউনিটেও প্রথম হন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ও তিনি সর্বাধিক নম্বর পেয়েছিলেন। সে বছর ঢাবির মেধাতালিকার প্রথম ১০ জনের তিনজনই মাদ্রাসা ছাত্র। যেখানে ৩৫ হাজার ২৮০ জন ছাত্র ফেল করেছেন, সেখানে প্রথম ১০ জনের তিনজনই মাদ্রাসা ছাত্র হওয়ার পরও কি এঁদের অযোগ্যই বিবেচনা করা হবে? আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, সে বছর ইংরেজিতে ১৫ নম্বর পাওয়ার শর্ত থাকলেও কলেজের মাত্র দুজন শিক্ষার্থী ১৫ পান অথচ আব্দুর রহমান মজুমদারের ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২৮.৫০। 'ঘ' ইউনিটেও বাংলা ও ইংরেজিতে আব্দুর রহমান মজুমদার ছিলেন শীর্ষে। বিজ্ঞান থেকে আসা কলেজ শিক্ষার্থীদের ইংরেজির সর্বোচ্চ নম্বর যেখানে ২২.৫০, সেখানে আব্দুর রহমানের ইংরেজির নম্বর ছিল ২৮.৫০। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের তিনজনেরই ইংরেজির নম্বর ছিল ১৫-এর ওপর। তবু তাঁরা পছন্দের বিভাগ পাননি।

দুর্বলদের জন্য কোটা চালু করা হয়। কিন্তু (২০১৪ সাল পর্যন্ত) ১০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পড়ার কারণে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজিতে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করে তাঁদের জন্য কোটা চালু না করে তাঁদের আরো কঠিন করে ২০১৫ সাল থেকে দাখিল (মাধ্যমিক) ও আলিমে (উচ্চমাধ্যমিক) ২০০ নম্বরের বাংলা ও ২০০ নম্বরের ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা হলো। অনেকের ধারণা ছিল, এতে মাদ্রাসা ছাত্ররা ঢাবির ভর্তিযুদ্ধে হেরে যাবেন। তাঁদের জন্য কঠিন করে দেওয়ার পরও থেমে নেই অগ্রযাত্রা। হেরে যাওয়ার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায়ও (পাসের হার ৯.৯৮ হওয়া সত্ত্বেও) 'ঘ' ইউনিটে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম হন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন। একই ইউনিটে মানবিক শাখা থেকেও প্রথম হন আরেক মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুস সামাদ। 'খ' ইউনিটে দ্বিতীয় হন মাদ্রাসা ছাত্র মো. রিজাত হোসেন। সর্বশেষ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষেও ঢাবির 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থানটি মাদ্রাসা ছাত্রের দখলেই। তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ মজুমদার মেধাতালিকায় প্রথম হন। পাসের হার যেখানে মাত্র ১১.৪৩ শতাংশ, সেখানে একজন মাদ্রাসা ছাত্র প্রথম হওয়ার পরও শুধু 'মাদ্রাসা ছাত্র' হওয়ায় তাঁকে বঞ্চিত করা মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়?

অদম্য মেধার পরিচয় দিলেও বিভিন্ন শর্তারোপ করে প্রথম সারির বিষয়গুলোর দরজা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এখনো বন্ধ। ১০০ নম্বরের ইংরেজি পড়েও ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া সত্ত্বেও ২০১৫ সাল থেকে মাদ্রাসার দাখিল ও আলিমে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে যারা এবার চান্স পেলেন, তাঁরা আলিমে (উচ্চমাধ্যমিক) ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পড়লেও দাখিলে (মাধ্যমিক) ১০০ নম্বরের পড়েছেন। তাই উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের শর্তারোপকৃত পাঁচটি বিভাগের দুয়ার তাঁদের জন্য খুললেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজির শর্তারোপকৃত প্রথম সারির ৯টি বিভাগ থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরা। এমনকি ভর্তি পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর পাওয়া আব্দুল্লাহ মজুমদারও পাবেন না এ সুযোগ।

বাংলাদেশে সরকারি মাদ্রাসা মাত্র তিনটি। এর বাইরে উচ্চশিক্ষায় ২০৫টি কামিল, ৩১টি ফাজিল (অনার্স) এবং এক হাজার ৪৯টি ফাজিল (পাস) মাদ্রাসা রয়েছে। (যুগান্তর : ২৪-০৮-২০১৫)

মাদ্রাসা ছাত্রদের এতগুলো কৃতিত্বের খবরের বিপরীতে চরম দুঃখের খবর হলো, মাদ্রাসার ছাত্ররা এত সফলতার স্বাক্ষর রাখার পরও বাংলাদেশে শত শত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেও সরকারি মাদ্রাসার সংখ্যাটি তিন থেকে ওপরে যাচ্ছে না কিছুতেই। মাদ্রাসা জাতীয়করণের কোনো নামগন্ধও নেই। এটা যেন নিয়ম হয়ে গেছে যে মাদ্রাসা জাতীয়করণ হবে না। সর্বশেষ গত জুলাই মাসে ১৯৯টি কলেজ জাতীয়করণ করা হলেও একটি মাদ্রাসাও জাতীয়করণ করা হয়নি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি, এমন কলেজ জাতীয়করণ হওয়া সত্ত্বেও পাসের হার ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকাশচুম্বী সাফল্যের স্বাক্ষর রাখার পরও জাতীয়করণের তালিকায় একটি মাদ্রাসার নামও না উঠায় মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ কি অস্বাভাবিক?

বাংলাদেশে শিক্ষা বোর্ড আছে ১০টি। ঢাবির 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্থান দখল করা প্রথম ১০ জনকে যদি বোর্ডওয়ারী ভাগ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেক বোর্ডে একজন করে পায়। ঢাবির 'খ' ইউনিটে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া প্রথম ১০ জনের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ছাত্ররা যদি একজনও পেত, তাহলেও তাঁরা অন্যদের সমান ছিল, সেখানে তাঁরা প্রতিবছরই প্রথম ১০ জনের তিন থেকে পাঁচজন। বর্তমানে একজন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীকে যা পড়তে হয়, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকেও তা-ই পড়তে হয়; বরং এর বাইরে তাঁদের কোরআন, হাদিস ও আরবি পড়তে হয়। এর পরও তাঁরা সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ফলাফলের ভিত্তিতে তো জাতীয়করণে মাদ্রাসাকেই প্রাধান্য দেওয়ার কথা ছিল। কারণ তাঁরা যেমন বাংলা-ইংরেজিতে দক্ষ হচ্ছেন, তেমনি তাঁরা আরবির মতো আন্তর্জাতিক একটি ভাষা শিখে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন; বুকের গভীরতম যে স্থানটিতে পবিত্র কোরআনুল কারিমকে ধারণ করেছে, ঠিক এর পাশেই মজবুতভাবে ধারণ করেছে লাল-সবুজের পতাকাকে। কলেজ-মাদ্রাসার সংখ্যা অনুপাতে অথবা ফলাফলের ভিত্তিতে, যেভাবেই জাতীয়করণ করা হোক—কোনোভাবেই তো মাদ্রাসা পিছিয়ে থাকার কথা নয়। জেলাপর্যায়ে একটি কামিল মাদ্রাসা জাতীয়করণ করা হলে রাষ্ট্রের খুবই অভাব হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই আমরা আশা করি, মাদ্রাসাগুলোর প্রতিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথাযথ গুরুত্ব ও ইনসাফের সঙ্গে নজর দেবেন।

লেখক : খতিব, বাইতুশ শফিক মসজিদ
বোর্ড বাজার (আ. গনি রোড), গাজীপুর